Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাট্যকার জাঁ পল সার্ত

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kabir Chowdhury
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.2
Pages	7-28
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাট্যকার জাঁ পল সার্ত

কবীর চৌধুরী

স্বদেশবাসী আলবেয়ার কাম্যুর সঙ্গে ফরাসী দার্শনিক, চিন্তাবিদ, কথা-সাহিত্যিক এবং নাট্যকার জাঁ পল সার্তের নানা দিক থেকে মিল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয়ের নাম অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। উভয়ই বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী ছাড়াও নিজেদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তাঁদের অস্তিত্ববাদী ধ্যান-ধারণাকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। কাম্যু ও সার্ত দুজনই কথা-সাহিত্যিক ও নাট্যকাররূপে বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে সাড়া জাগিয়েছেন ; দুজনের উপরেই মার্ক্সবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে, যদিও কাউকেই পুরোপুরি মার্ক্সবাদী বলা যাবে না ; দুজনই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাহসী সক্রিয় প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাট্যক্ষেত্রে কাম্যুর অবদান চারটি মৌলিক ও দুটি রূপান্তরিত নাটক, সার্তের আটটি মৌলিক ও তিনটি রূপান্তরিত নাটক। দুজনই তাঁদের প্রথম ও সর্বাধিক পরিচিতি নাটকের জন্য ক্লাসিকাল মিথের দ্বারস্থ হন। কাম্যু বেছে নেন রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার জীবন ও অসম্ভব কর্মকাণ্ড, সার্ত গ্রীক যুবরাজ ওরেস্টিসের অসামান্য প্রতিবাদী ভূমিকার ইতিবৃত্ত। নানা দিক থেকে আরো সাদৃশ্য আছে, অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যও লক্ষনীয়। সে আলোচনায় আমরা পরে প্রবৃত্ত হব।

সার্ত জন্মগ্রহণ করেন প্যারিসে, ১৯০৫ সালের ২১শে জুন। বয়স এক বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর পিতা, নৌবাহিনীর একজন অফিসার মৃত্যুবরণ করেন। সার্তের শৈশব কাটে মাতামহ শার্ল শোরইৎজারের তত্ত্বাবধানে। সার্ত এই সময় এক রকম স্বাধীনভাবে, অনেকটা নিঃসঙ্গতার মধ্যে, বেড়ে ওঠেন। মাতামহের বিশাল লাইব্রেরীর অনেক বই তিনি পড়ে ফেলেন। পরে তিনি ফ্রান্সের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকোল নর্মাল সুপিরিয়র-এ ভর্তি হন এবং একজন প্রতিভাদীপ্ত কৃতী ছাত্র

হিসাবে ১৯২৮ সালে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। সার্তের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সিমঁ দ্য বুভোয়া, সার্তের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সারা জীবনের সঙ্গিনী, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী ও লেখিকা, দুঃসাহসীভাবে স্বাধীনচেতা। সার্ত এবং সিমঁ সামাজিক বিয়ে না করে আমৃত্যু একত্রে বসবাস করেন। প্রচলিত মূল্যবোধের উপর উভয়েরই ছিলো গভীর বীতরাগ, তাছাড়া সন্তান লাভের ব্যাপারেও তাদের দুজনের কারো কোনো আগ্রহ ছিলো না। তবে শেষ জীবনে তারা আর্লেৎ এল কাইমকে পালিকা কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৯-এ আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রী লাভের পর সার্ত কিছু দিন সেনা-বাহিনীর আবহাওয়া বিভাগে চাকুরী করেন, তারপর প্রায় দু'বছর, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত, লা হাভর-এ দর্শনের অধ্যাপকরূপে শিক্ষকতা করেন। এর পরের এক বছর তিনি কাটান বার্লিনে, সেখান থেকে ফিরে এসে আবার তিনি ফ্রান্সে শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বার্লিনে থাকাকালীন তিনি মূল জার্মান ভাষায় হেগেল এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ইয়েসপার্স ও হাইডেগারের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। এই সময় থেকেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের প্রশ্ন তাঁকে বিশেষভাবে তাড়িত করতে থাকে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধগ্রন্থ ও গল্প উপন্যাসের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটলো। এগুলি হল "ইমাজিনেশন" (১৯৩৬), "স্কেচ ফর দি থিওরী অব ইমোশন" (১৯৩৯), "দি সাইকোলজি অব ইমাজিনেশন" (১৯৪০); "নসিয়া" নামের উপন্যাস (১৯৩৮) এবং "দি ওয়াল এণ্ড আদার স্টোরিজ" নামের গল্পগ্রন্থ (১৯৩৯)। এই গ্রন্থগুলি তাঁকে স্বদেশে দার্শনিক ও কথাসাহিত্যিক রূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর বিপুল বিশ্বখ্যাতি সুনিশ্চিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর।

১৯৩৯ সালে একেবারে গোড়ার দিকেই সার্ত সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪০-এর জুন মাসে তিনি জার্মানদের হাতে বন্দী হন এবং ১৯৪১ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী হিসাবে বন্দী শিবিরে কাটান। সেখান থেকে পালানোর পর তিনি সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামে কাজ করেন গোপনে, আর প্রকাশ্যে নিযুক্ত থাকেন শিক্ষকতার কাজে। গোপন অবস্থায় থেকে কাম্যুর সঙ্গে মিলে এই সময় তিনি একটি প্রতিরোধমূলক খবরের কাগজও বের করেন। তাছাড়া এই সময় বন্দী স্বদেশে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর

বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ "বিইং এ্যান্ড নাথিংনেস" (১৯৪৩), এবং তাঁর প্রথম নাটক "দি ফ্লাইজ" (১৯৪৩) বা "মাছি"। জার্মানদের চোখের সামনে, গ্রীক মিথের আড়ালে, তিনি এই শক্তিশালী ফ্যাসী-বিরোধী নাটকটি লেখেন এবং এর মধ্য দিয়ে একদিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেন, অন্যদিকে সঙ্কটের মুহূর্তেই যে মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় সেই কথাটি তুলে ধরেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় নাটক "নো এক্‌জিট" বা "দ্বাররুদ্ধ", যার মধ্যেও প্রতিফলিত হয় তাঁর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

যুদ্ধ শেষ হবার পর সার্তের খ্যাতি দ্রুত স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচনায় পাঠককুল মানসিক অস্তিত্বের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ পেল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের দিনগুলির স্মৃতি, সর্বোপরি প্রতিরোধ সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সার্তের অস্তিত্ববাদী ভাবনা আরো বিকশিত হয়। এর পরিচয় আমরা পাই তাঁর যুদ্ধোত্তর কালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে। এগুলির মধ্যে রয়েছে, নাটকের অঙ্গনে, দুই অঙ্কের "সমাধিবিহীন মৃত" (১৯৪৬), যা "বিজয়ী" এবং "ছায়াহীন মানুষ" নামেও অনূদিত হয়েছে; এক অঙ্কের "শ্রদ্ধাভাজন বারাঙ্গনা" (১৯৪৬); সাত দৃশ্যের "নোংরা হাত" (১৯৪৮); তিন অঙ্কের "শয়তান এবং ঈশ্বর" (১৯৫২); পাঁচ অঙ্কের "কীন, অথবা বিশৃঙ্খলা এবং প্রতিভা" (১৯৫২); আট দৃশ্যের "বেক্কাসভ" (১৯৫৬); পাঁচ অঙ্কে "আল্টোনার দণ্ডপ্রাপ্ত" (১৯৬০); এবং "ক্লকওয়ার্ক" (১৯৬৯-এ মঞ্চায়িত)।

যুদ্ধের পর সার্ত শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নাটক ছাড়াও এই সময় তিনি রচনা করেন "স্বাধীনতার পথ" নামক তাঁর তিনখণ্ডের উপন্যাস মালা। এর প্রথম খণ্ডের নাম "দি এজ অব রীজন" (১৯৪৫), দ্বিতীয় খণ্ডের "দি রিপ্রীভ" (১৯৪৫), এবং তৃতীয় খণ্ডের "আয়রন ইন দি সোল" (১৯৪৯)।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে সমালোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ "বোদলেয়ার" (১৯৪৭); স্বদেশের সাড়া জাগানো বিতর্কিত নাট্যকারের

জীবন ও কর্মের উপর লেখা "সাঁ জেনে্য : এ্যাক্টর এ্যান্ড মার্টার" (১৯৫২); এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "দি ওয়ার্ডস" (১৯৬৪)। শেষোক্ত গ্রন্থটির অসাধারণ সাহিত্যমূল্য বিশেষভাবে নানা মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রকাশের বছর ১৯৬৪ সালেই তাঁকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু তিনি এ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে দেশে-বিদেশে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে সার্ত যখন আলজেরীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন, নিজের দেশের সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তখন বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো। কিন্তু সার্ত নিজের জীবনেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে জীবনের অর্থ আবিষ্কার করেন, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেন। আমাদের আলোচনার এই পর্বে সার্তের অস্তিত্ববাদী দর্শন সম্পর্কে সামান্য বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থিত করা যাক।

সার্ত তাঁর একাধিক লেখায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে মানুষ কোনো কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সে নিজেই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। মানুষ নিজেকে যেভাবে গড়ে তোলে সে প্রকৃতপক্ষে তাই। এই গড়ে তোলার ব্যাপারে তার সচেতন ইচ্ছার বিষয়টি কেন্দ্রীয়। সে যদি কোনো কিছু অভি-প্রায়ের ভিত্তিতে করে, তার গৃহীত কার্যক্রমের ভিত্তি যদি হয় সচেতন নির্বাচন, তাহলে সে স্বাধীন। বাইরের চাপ বা ভাবাবেশ বা আকস্মিক যোগাযোগের ফলে যে কর্ম সাধিত হয় তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটে না। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ "নির্বাচনের স্বশাসন"। সফলতা বা ব্যর্থতা বড়ো কথা নয়, কোনো কিছু করার জন্য ইচ্ছা করা, সচেতনভাবে কোনো কাজ বেছে নেয়া, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বেছে নেয়াটা খামখেয়ালীপনা নয়, মানুষ তার একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সত্ত্বেও তার কাজের জন্য নিজের কাছে যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী তার সহচরদের কাছেও। তাই একজন মানুষ যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে শুধু নিজের জন্যই নয়, সে ওই সিদ্ধান্ত নেয় সমগ্র মানবজাতির জন্য। সেজন্যই সে একই সঙ্গে নিজের ও অন্যের জন্য যেমন স্বাধীন, তেমনি অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দায়িত্বশীলও। এই দৃষ্টিকোণের ফলেই সার্ত তাঁর অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদী দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হন, যদিও তাঁর সে-সমন্বয় প্রয়াস সর্বাংশে সার্থক হয় নি।

১৯৬৪ সনে সার্তকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার কথা আগে উল্লেখ করেছি। সেই পুরস্কার প্রত্যাখান প্রসঙ্গে সার্ত বলেছেন যে ওই ধরনের পুরস্কার গ্রহণ লেখককে একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিণত করে এবং এই ইঙ্গিত করেছেন যে তা লেখকের স্বাধীনতা ও বিদ্রোহী সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে। তিনি আরো বলেন যে আলজেরিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি এবং আরো শতাধিক ব্যক্তি যখন আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে স্বাক্ষরিত বক্তব্য প্রকাশ করেন তখন যদি তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ত তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, কারণ তখন ওই পুরস্কার দ্বারা শুধু তিনি নিজে নন, আলেজেরিয়ার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা সবাইকে সম্মানিত করা হত।

প্রতিবাদী ও সংগ্রামী রাজনীতির সঙ্গে সার্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো আজীবন। এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। ১৯৫১ সালে কাম্যু তাঁর বিখ্যাত "বিদ্রোহী" গ্রন্থে সাম্যবাদের বিরূপ সমালোচনা করলে কাম্যুর সঙ্গে সার্তের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৫২ সালে সার্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভিয়েনায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আবার ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন হাঙ্গেরীতে অভিযান চালায় তখন সার্ত তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন এবং ১৯৬৬ সালে বার্ট্রান্ড রাসেল যখন "যুদ্ধাপরাধ আদালত" গঠন করেন তখন প্রথমে এর সদস্য হন এবং পরে ওই সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এই আদালতই ১৯৬৭ সালে মার্কিন সরকারকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণ-অত্যাচারের প্রতিবাদেও সার্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতাকামী এই প্রবল তেজস্বী মানবতাবাদী বিবেকবান সাহিত্যিক তাঁর জীবনের প্রায় সর্ব-পর্যায়ে সব ধরনের অত্যাচার নির্যাতন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন।

সার্তের প্রথম নাটক "মাছি"-তেই আমরা নাট্যকারের প্রতিবাদী কমিটেড শিল্পীর দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষ করি। অস্তিত্ববাদী দর্শনের

কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সচেতনভাবে দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টিও আমরা এখানে স্পষ্ট দেখতে পাই।

"মাছি" গ্রীক ওরিস্তীয় পুরাণ কাহিনীর নব-রূপায়ণ। প্রাচীন গ্রীক কাহিনীতে আর্নসের বর্তমান অভিশপ্ত অবস্থার মূলে রয়েছে বংশ পরম্পরায় অনুষ্ঠিত পাপকর্ম এবং সর্বশেষ ক্লাইটেমনেস্ট্রা কর্তৃক স্বামী ও রাজা আগামেমননের নিধন পর্ব। সমগ্র জনগোষ্ঠি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করায়, প্রতিরোধ না গড়ে তোলায়, তারাও পরোক্ষে ওই অন্যায়ের অংশীদার হয়েছে।

সার্তের ওরেস্টিস কিন্তু প্রাচীন গ্রীক মিথের ওরেস্টিস নয়। তার মুখ্য ভূমিকা পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী রূপে নয়, বরং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর ত্রাণকর্তা হিসাবে। "মাছি" নাটকে সে যখন আর্নসে ফিরে আসে তখন সে একজন তরুণ বুদ্ধিজীবী, জীবনের অর্থ অন্বেষণরত সুদীর্ঘ প্রবাস জীবন যাপনের পর সে দেশে ফিরে দেখে সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত, বেঁচে আছে কীটের মতো, দাসের মতো, বহুদিন পূর্বের রাণী ক্লাইটেমনেস্ট্রা কর্তৃক তার প্রেমিক ইজিস্থাসের সহযোগিতায় রাজা ও স্বামী আগামেমনন হত্যার প্রতিবাদ না করায় দেবতাদের হাতে এখন কঠিন শাস্তি ভোগ করছে। তাদের ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা, নির্বিবাদে অন্যায়কে সহ্য করে যাওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসাবে দেবতারা দেশের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন কোটি কোটি মাছি। এই হচ্ছে সার্ত সৃষ্ট নতুন মহামারী।

ওরেস্টিস আর্নসে ফিরে আসে নিজের পরিচয় গোপন রেখে। ইলেক্ট্রার সঙ্গে তার দেখা হয় কিন্তু বোন ভাইকে চিনতে পারে না। পরে তার পরিচয় জানতে পেরে ইলেক্ট্রা উল্লসিত হয়ে ওঠে। এবার পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গৃহীত হবে। আগামেমননের পুত্র, তার ভাই, ওরিস্টিসের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে মা ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও মায়ের প্রণয়ী ইজিস্থাসকে।

ওরেস্টিস কিন্তু প্রথম দিকে রক্তপাতের পথে যেতে চায় না কিন্তু পরে সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম পর্বের শেষ দৃশ্যে ইলেক্ট্রা ভীত হয়ে ওঠে, ওরেস্টিসকে শিগগির পালিয়ে যেতে

বলে, কিন্তু ততক্ষণে ওরেস্টিস একটা পথ খুঁজে পেয়ে গেছে। বোনকে উদ্দেশ্য করে সে বলে: "···পথ আরেকটা আছে···সে পথ আমার পথ···সে পথের শুরু এখানে কিন্তু নামতে নামতে তা শেষ হয়েছে ওই শহরে।···আমাকে যেতে হবে সেখানে, ঠিক তোমাদের মাঝখানে। তুমি আমার বোন, আর এ শহর আমার শহর।" ওরেস্টিসের জীবন একটা নতুন বাঁক নিচ্ছে। এবং এটা ঘটছে তার নিজের ইচ্ছায়। কাব্যময় ভাষায় সার্ত এখানে ওরেস্টিসের সংলাপ রচনা করেছেন। জীবনের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে ওরেস্টিস বোনকে উদ্দেশ্য করে বলে: "···আমাকে একটি বার বিদায় নিতে দাও সেই চঞ্চলতার কাছ থেকে যা ছিলো একান্ত আমার। বিদায় নিতে দাও আমার যৌবনের কাছ থেকে। পাখির গান আর মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা এবং আর্নসের এই সোনালী সন্ধ্যাকে আমি আর কোনদিন জানবো না, জানবো না আশার আলোতে দীপ্ত সকালকে—বিদায়, এ সব কিছুকে বিদায়।··· এসো ইলেক্ট্রা, এসো আমাদের শহরকে দেখি। ওই যে দূরে বৈশাখের পড়ন্ত রোদে রাঙা, মানুষ আর মাছির গুঞ্জনে মুখরিত, খরতাপে নিস্পন্দ নিদ্রালু আর্নস। এ শহরের দেয়াল দরজা ছাদ সব কিছু আমার জন্য রুদ্ধ। কিন্তু তা হলেও এগুলো আমারই গ্রহণ করার অপেক্ষায় অধীর—আজ সকাল থেকেই একথাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে···আমি একটা কুড়োল হয়ে এই নিরেট দেয়ালগুলোকে ভাঙবো, এই বন্ধ বাড়িগুলোর পেট ছিঁড়ে ফেলবো আর সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে পচা খাবার আর লোবানের গন্ধ। আমি একটা কুড়োল হয়ে এ শহরের হাৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকবো, যেমন কুড়োল ঢোকে ভূপাতিত বৃক্ষের অন্তরে।"

ইলেক্ট্রার প্রশ্নের উত্তরে ওরেস্টিস জানায় যে সে সবার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয় নি, সে শুধু তাদের অনুশোচনাকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছে। এবং, তাই, তার নিজেকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্য, আর্নসকে বাঁচাবার জন্য। আর্নসকে দেবতাদের অভিশাপ মুক্ত করার জন্য তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে ওই শহরের অগুণতি মাছির মতো শত সহস্র অনুতপ্ত আত্মার দহনকে, অর্জন করতে হবে তাদের মাঝে তাদেরই একজন হবার অধিকার। এবং সে-কারণেই ক্লাইটেম-নেস্ট্রা ও ইজিস্থাসকে হত্যা করতে না চাইলেও তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত

সে গ্রহণ করে প্রশান্ত চিত্তে। মানুষ যখন একবার স্বাধীন ভাবে এজাতীয় সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে অসম্ভব শক্তিমান হয়ে ওঠে। দেবতাদের রাজা জীয়ুসও তা জানেন। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়: "একবার মানব মনে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বললে দেবতারা সে মানুষের কাছে নির্বীর্য নপুংসক।" ওই শক্তি অর্জনের ফলেই ওরেস্টিস ইজিস্থাসকে বলতে পারে, "জীয়ুসের কে পরোয়া করে? ন্যায় নীতি তো মানুষের ব্যাপার—ওটা শেখার জন্য কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। তোমার মতো দুষ্টকে নিশ্চিহ্ন করাটাই ন্যায় বিচার—আর্নসের জনগণের উপর তোমার প্রভাব মুছে ফেলে তাদের আত্ম মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়াই ন্যায় সঙ্গত।" অতঃপর ওরেস্টিস প্রথমে ইজিস্থাস ও তার পরে ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে হত্যা করে এবং সে অনুভব করে এক অপূর্ব মুক্তির আনন্দ, স্বাধীনতার উল্লাস। তার ভাষা হয়ে ওঠে ছন্দময়, কবিতার মতো। ইলেক্ট্রা যখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে মাতৃ ঘাতক, এ নির্মম সত্যকে সে কখনো মুছে ফেলতে পারবে না, তখন ওরেস্টিস দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়: "তুমি কি বিশ্বাস করো আমি তা মুছে ফেলতে চাই! আমি আমার কাজ করেছি—আর সে কাজটা ছিলো অনিবার্য রূপে সঙ্গত। আর আমি তা বহন করবো খেয়া নৌকা যেভাবে যাত্রীদের ওপারে বয়ে নিয়ে যায় সেইভাবে। আমিও ওপারে পৌঁছেই হিসাব করবো। বোঝার ভার যত বেশী হবে আমি ততই খুশী হবো। কেননা, আমার বোঝাটাই আমার মুক্তি। এই গতকালও আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলেছি। হাজারও পথ আমি মাড়িয়েছি—কিন্তু চলাই কেবল সার হয়েছে—কারণ সেগুলো ছিল অন্য মানুষের পথ।...আজ আমার সামনে একটি মাত্র পথ। ঈশ্বর জানেন এপথ কোথায় নিয়ে যাবে আমায়। কিন্তু এ একান্তই আমার পথ।" ওরেস্টিসের এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস প্রণোদিত কর্মকেই সার্ত বলেছেন টোটাল কমিটমেন্ট, আর এই টোটাল কমিটমেন্টের জন্য ওরেস্টিস হয়ে ওঠে, রুবি কোহন-এর ভাষায়, "এ পজিটিভ হিরো।" তবে তার ওই বিশ্বাস ও কর্মের জন্য এবার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাছি, প্রতি হিংসা আর অনুশোচনার দেবীরা, ফিউরিরা, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের ওপর শহর ও শহরবাসী সবার পাপ স্বেচ্ছায় টেনে নিয়ে ওরেস্টিস আর্নসকে শুদ্ধ করে তোলে, মাছির ঝাঁককে সঙ্গে নিয়ে সে শহর ছেড়ে চলে যায়, যেমন একদিন রূপকথার বংশীবাদক ইঁদুরের পালকে সঙ্গে নিয়ে

নগর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। নাটকের শেষ দৃশ্যে ওরেস্টিস জনতাকে উদ্দেশ্য করে তার দীর্ঘ উচ্চকিত ভাষণে বলে, "তোমরা সেদিন একজন অপরাধীকে রাজা বলে বরণ করেছিলে আর সে অপরাধ অপরাধী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা প্রভুহারা কুকুরের মত সারা শহরে ঘুরে বেড়ালো। বুঝলে, আর্নসের অধিবাসীরা, আমার অপরাধ একান্তই আমার··· এ আমার গৌরব, আমার জীবনের আরব্ধ কাজ। তোমরা আমাকে না দিতে পারো শাস্তি, না করতে পারো করুণা। সে জন্যই আমাকে দেখে তোমরা ভয় পাচ্ছো, কিন্তু তবু, আমার দেশবাসী, আমি তোমাদের ভালোবাসি। আর তোমাদের জন্যই আমি হত্যা করেছি।···

"মৃতদের আর তোমরা ভয় করো না। মৃতরা এখন আমার। চেয়ে দ্যাখো তোমাদের অনুগত মাছিরা তোমাদের পরিত্যাগ করেছে, ওরা এখন এসেছে আমার কাছে। ভয় পেয়ো না দেশবাসী আমার, আমি নিহত রাজার সিংহাসনে বসবো না, কিম্বা এই রক্ত রঞ্জিত হাত ধারণ করবে না ওই রাজদণ্ড। দেবতা আমাকে ওটা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাকে না বলেছি। আমি রাজ্যহীন ও প্রজাহীন এক রাজা হতে চাই।

"বিদায় হে আমার দেশবাসী, তোমাদের জীবনকে নতুন ভাবে নড়াবার চেষ্টা করো। এখানে সবই নতুন, সবই এখানে শুরু হবে নতুন করে। আমার জন্যও এক নতুন জীবন শুরু হচ্ছে, এক আশ্চর্য বিস্ময়কর জীবন।"

জীয়ুসের সকল রকম প্রলোভন ও আশ্বাস, অনুতাপ-অনুশোচনা করার পরামর্শ, শাস্তির ভয় সব উপেক্ষা করে ওরেস্টিস তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, ইলেক্ট্রার পক্ষে যা সম্ভব হয় না। "মাছির"-র আলোচনা প্রসঙ্গে রেমন্ড উইলিয়ামস মন্তব্য করেছেন: "Sartre's Orestes can do what Ibsen's Brand cannot do ; and the alteration of possibility is in terms of the fable. The single desperate act, which will liberate a whole people, is convested from fantasy to a persuasive theatrical action."[১] এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে যখন সার্তের "মাছি" প্যারিসে প্রথম মঞ্চায়িত হয় তখন ফরাসী দর্শকবৃন্দ এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তাদের

সমকালকে প্রত্যক্ষ করেছিলো। তারা অপরাধের ভারে ন্যুব্জ আর্নসের মধ্যে দেখেছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল পেতাঁ (ইজিস্থাস) শাসিত অধিকৃত ফ্রান্সের ভিচি সরকারকে, জার্মান জিয়ুসের সামনে যা দাসানুদাসের মত নতজানু, লক্ষকোটি মাছির মতো নাৎসীদের দ্বারা যা সতত তাড়িত ও লাঞ্ছিত। মজার ব্যাপার এই যে নাৎসীদের প্রায় নাকের ডগার নিচে রচিত হলেও নাটকটির গূঢ় মর্মার্থ তাদের চোখে ধরা পড়ে নি।

সার্তের দ্বিতীয় নাটক "দ্বাররুদ্ধ" (১৯৪৪)। এবার আর প্লটের জন্য তিনি গ্রীক মিথের কাছে যান নি, যদিও সচেতন ভাবে ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ ও তার চূড়ান্ত ভূমিকা তথা অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিষয়টি "মাছি"-র মতো এ-নাটকেরও অন্যতম উপজীব্য। বস্তুতঃপক্ষে "দ্বাররুদ্ধ"-তে দার্শনিক তত্ত্বীয় আলোচনাই মুখ্য, নাটকের অঙ্গনে সাধারণভাবে প্রত্যাশিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে তুলনামূলকভাবে গৌণ। এখানে ঝোঁকটাও তাই চরিত্রের উপর ততটা পড়েনি, যতটা পড়েছে পরিস্থিতির উপর। আর সার্ত এটা করেছেন সচেতনভাবে।

এই এক অঙ্কের দার্শনিক নাটকের ঘটনাস্থল হচ্ছে নরক, যদিও তার চেহারা ফরাসী দ্বিতীয় রাজতন্ত্রের সময়কার একটা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বসবার ঘর। ওই ঘরে এসে জমায়েত হয়েছে সদ্য প্রয়াত তিনজন মানুষ। একজন পুরুষ, নাম গার্সিন, অন্য দুজন রমণী, ইনেজ ও এস্তেল। তিনজনই, বলা যেতে পারে, অভিশপ্ত। তাদের জীবন অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণে কালিমালিপ্ত হয়েছিলো, কিন্তু সার্ত যেভাবে নাটকটি পরিবেশন করেছেন তাতে গুরুত্ব পড়েছে অতীতের উপর নয়, বরং বর্তমানে, এই নরকে, তারা কোন পথ বেছে নেবে তার উপর।

একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বন্দী অবস্থায় গার্সিন, ইনেজ ও এস্তেল নিজেদের পরিচয় লাভ করে, পরস্পরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে একটা চক্রাকার সম্পর্কের নক্সা গড়ে ওঠে এবং তাই নির্মাণ করে নাটকের ঘটনা।

গার্সিন একজন সংগ্রামী শান্তিবাদী কিন্তু এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সে তার বিশ্বাস ও সংগঠনের সঙ্গে অবিচল একাত্মতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং পালিয়ে যাবার সময় গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। কিন্তু প্রশ্ন হল সে

কি কাপুরুষ? তার কাজের পেছনে কি কোনো অকাট্য যুক্তি ছিলো? পালানোই কি ছিলো তার প্রকৃত উদ্দেশ্য? নাটকে এস্তেল আর ইনেজের সঙ্গে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তরের কিছুটা আভাস পাই।

এস্তেল এক কামপরায়ণা নারী। বাবার বয়সী স্বামীর সঙ্গে দু'বছর সুখী জীবন কাটাবার পর তার দেখা হয় মনের মানুষের সঙ্গে। তাদের মিলন জাত অবৈধ সন্তানকে এস্তেল হত্যা করে এবং এই কাজের ফলে নিজের প্রেমিককে ঠেলে দেয় আত্মহননের পথে, নিজেও অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

আর ইনেজ লেসবিয়ান, সমকামী। বিবাহিতা রমণী ফ্লোরেন্সের সত্তাকে সে নিজের মধ্যে শুষে নিয়েছিলো। ইনেজ আর ফ্লোরেন্স দুজনে মিলে ফ্লোরেন্সের স্বামীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলো, আর লোকটি ছিলো ইনেজেরই সম্পর্কিত ভাই। শেষে সে ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে, আর জ্বলেপুড়ে খাক হওয়া হৃদয় নিয়ে ফ্লোরেন্স একদিন ঘুমন্ত ইনেজকে বিছানায় রেখে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে গ্যাস খুলে দিয়েছিলো।

এই তিন চরিত্র এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে, অথচ নিজেদের স্বকীয়তায় তারা স্বতন্ত্রও বটে। শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য তো আছেই, তাছাড়াও নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির মাত্রার দিক থেকেও তারা একে অন্যের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তির স্বচ্ছতায় এবং অন্তরের বিশ্লেষণের সততায় ইনেজ সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গার্সিনকেও আমরা শেষ দিকে দেখি যে সে সাহসের সঙ্গে নিজের জীবনের অর্থ আবিষ্কার ও উপলব্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে, ইনেজকে সে পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

নাটকের মধ্যে অনেক স্থানে সার্ত নিতান্ত নিরাভরণভাবে দার্শনিক তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন। এক সময় এস্তেল যখন তাদের তিন-জনের একত্রে ওই ঘরে অবস্থান করা সম্পর্কে মন্তব্য করে যে এটা নেহাৎ দৈবের ফল তখন ইনেজ সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুধরে দেয়। ইনেজ বলে উঠে; "নেহাৎ দৈব? তাহলে এই ঘরের সাজসজ্জাও দৈবেরই ফল? ঐ যে সোফাটা গাঢ় সবুজ, আর বাঁ ধারেরটা ক্ল্যারেট রং-এর——এও দৈব?

নেহাৎ ঘটনাচক্র ? ···শুনে রাখো, ওরা সব কিছু আগে থেকেই ভেবে চিন্তে ঠিক করে রেখেছিলো, একেবারে নখ থেকে চুল পর্যন্ত। কোনো কিছুই দৈবের উপর ফেলে রাখা হয়নি। এ ঘর আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।"

অন্যত্র ইনেজকে উদ্দেশ্য করে গার্সিন বলে, "আমরা পরস্পরের কতটুকুই বা জানি যতক্ষণ না নিজে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করছি।··· যদি আমরা সবাই অতীত পরিচয় উন্মোচন করি তবে হয়তো আত্ম-ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি।"

তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে মুক্তির পথ খোঁজে। নাটকের অন্তিম-লগ্নে গার্সিন উচ্চারণ করে, "এই তা হলে নরক। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। মনে আছে, মর্তে শুনেছি এখানে নির্যাতন কক্ষ আছে, আছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, ফুটন্ত লাভা, পূতিগন্ধময় নদী, আরো কতো কি ! যতোসব বুড়ীদের কেচ্ছা ! উত্তপ্ত লৌহশলাকার কোনো প্রয়োজন নেই। নরক হচ্ছে—আমার তোমার সবার একত্র অবস্থান। নরক হচ্ছে—অন্য মানুষ।" গার্সিনের উচ্চারণ যেন একটা সত্য তুলে ধরেছে, অপরের ব্যক্তিগত মূল্যায়নকে বাদ দিয়ে কারো পক্ষে কোনো বিষয়ের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়, জীবনে কিম্বা নরকে আত্মানুসন্ধানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কিম্বা ঔদাসীন্য অথবা নিরাসক্তিকে প্রশ্রয় দেয়া সম্ভব নয়। গার্সিন যখন পালানোই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো কিনা এই প্রশ্ন তোলে তখন ইনেজ বলে, "সেইটেই মূল প্রশ্ন···সন্দেহ নেই যে তুমি বিষয়টি নিয়ে নিজের সাথেই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের অবতারণা করেছো, নিক্তির ওজনে পুংখানুপুংখ বিচার করেছো, অবশেষে তোমার কাজের পক্ষে তুমি যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলে। কিন্তু ভীতি আর ঘৃণা এবং নোংরা প্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধকারে রেখে দেয়। সেগুলিও মানব জীবনের কর্মকৃতিকে পরিচালিত করে। অতএব, গার্সিন, চালিয়ে যাও, এবং অন্ততঃ একবারের জন্য হলেও নিজের প্রতি সৎ হতে চেষ্টা করো।" সঙ্গতভাবেই এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে : *"No Exit* is an intense and morning restatement of the primacy of personal authenticity and engagement." তবে ভাষ্যকার যখন বলেন, "In its filting together of imagination and ideological values, it is

probably Sartre's best play,"[২] তখন ওই উক্তিকে আমি দ্বিধাহীন সমর্থন জানাতে পারি না। আমার বিবেচনায় তাঁর "মাছি", নাটক হিসাবে, অধিকতর আবেদনময় ও সফল।

১৯৪৬ সালে রচিত সার্তের পরবর্তী নাটক হল "সমাধিবিহীন মৃত", ইংরেজীতে যা "বিজয়ী" এবং "ছায়াহীন মানুষ" নামে অনূদিত হয়েছে। এর পটভূমি ১৯৪৪ সালের ফ্রান্স। নাৎসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাটকটির বিষয়-বস্তু নির্মাণে সাহায্য করেছে। কয়েকজন প্রতিরোধ সংগ্রামী যখন দালাল ভিচি কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে তখন দলপতির গোপন আবাসস্থল জানিয়ে দেবার জন্য ওদের উপর নির্যাতন চালানো হয়, নানা ভাবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন আত্মহত্যা করে, আরেকজনকে সহকর্মীরাই হত্যা করে যেন সে গোপন কথা ফাঁস করে দিতে না পারে, বাকী তিনজন চুপ করে থাকতে চাইলেও উপলব্ধি করে যে নিরর্থক মৃত্যু-বরণ করার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে কিন্তু বীরত্ব নেই, তাই তারা "স্বীকারোক্তি"-ও করে, কিন্তু তবু এক নির্মম জল্লাদ অফিসারের গুলীতে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। "ছায়াহীন মানুষ"-এ সার্ত প্রায় প্রকৃতিবাদী ধারায় নাট্যমঞ্চে ভীষণ ও রক্তাক্ত ঘটনা তুলে এনেছেন, বন্দীশিবিরে জিজ্ঞাসাবাদ নির্যাতন হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য পরিবেশন করে ফ্রান্সের সমকালীন দর্শকশ্রোতৃবর্গকে নিজেদের নিকট অতীত ইতিহাসের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতর্ক ও স্পর্শকাতর পাঠক দর্শকের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ কি ভাবে, কেমন আচরণ করে, তা পরীক্ষা করে দেখা। আমরা সহজেই সমালোচকের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারি: "Close to naturalism in its concentration on the excruciatingly painful, the play (Dead without Burial) is at the same time a powerful and mourning tribute to the heroism of ordinary men and women under unusual stress."[৩]

তাঁর পরবর্তী নাটক "শ্রদ্ধাভাজন বারাঙ্গনা"-য় (১৯৪৬) সার্ত বেছে নিয়েছেন ভিন্ন পটভূমি, ভিন্ন বিষয়বস্তু। সামাজিক বাস্তবতার আঙ্গিক

অনুসরণ করে নাট্যকার এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে কালো মানুষের উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলে এবং বিচারের নামে যে প্রহসন ঘটে তার ছবি এঁকেছেন। মেলোড্রামা ও থিসিস নাটকের মিশ্রণ ঘটেছে "শ্রদ্ধাভাজন বারাঙ্গনা"-য়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অসততা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে সার্ত প্রতিবাদী সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অবস্থানকে এখানেও অক্ষুণ্ণ রাখেন।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ও মঞ্চায়িত সার্তের সাত দৃশ্যের নাটক "নোংরা হাত"-এর বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক। নাটকের ঘটনাস্থল "ইলিরিয়া" নামক মধ্য ইউরোপের একটি দেশ, ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, দেশটি জার্মান-অধিকৃত, রুশ বাহিনী কর্তৃক শত্রুমুক্ত হয় নি তখন পর্যন্ত। নাটক যখন শুরু হয় তখন হিউগো দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছে। হিউগো এক তরুণ বুর্জোয়া আদর্শবাদী, কমিটমেন্টের আকাঙ্ক্ষায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলো, সাজা প্রাপ্ত হয়েছিলো পার্টি প্রধান হোয়েডারারকে হত্যা করার অপরাধে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে ছুটে যায় পার্টি সহকর্মী ওলগার কাছে। এদিকে কম্যুনিস্ট নেতা লুইকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে হিউগোকে হত্যা করার জন্য। লুই তাকে অনুসরণ করে, এবং ওলগার অনুরোধে হিউগোকে তার নিজের দিক থেকে সব কিছু খুলে বলবার সুযোগ দেয়। তার বক্তব্য শোনার পর লুই হিউগোর ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এর পর নাট্যকার ফ্ল্যাশ ব্যাকের মাধ্যমে হিউগো কর্তৃক হোয়েডা-রারকে হত্যা করার পটভূমি ও কার্যকারণ সম্পর্ক আমাদের সামনে উন্মোচিত করেন। আমরা জানতে পারি যে দু'বছর আগে কম্যুনিস্ট পার্টির ভেতর একটা দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি ঘটে। হোয়েডারার অন্য রাজ-নৈতিক দলগুলির সঙ্গে আপোষ ও সমঝোতার কথা বলেন কিন্তু লুই এবং পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এর বিরোধিতা করে। আদর্শবাদী হিউগো লুইর চিন্তাধারা ও অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং হোয়েডারারকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য লুইর সচিব হিসাবে কাজ নেয়। কিন্তু হিউগো ও তার স্ত্রী হোয়েডরারের নিকট সান্নিধ্যে এসে,

হোয়েডরারের সঙ্গে কাজ করে, তাকে সে পছন্দ করতে শুরু করে, তার মধ্যে অনেক প্রশংসনীয় জিনিষ আবিষ্কার করে। হিউগো অবশ্য পার্টি লাইন থেকে সরে আসে নি, তবু শেষ পর্যন্ত একটা আবেগময় ও আকস্মিক অরাজনৈতিক পরিস্থিতির অজুহাত উপস্থিত হবার পরই শুধু সে হোয়েডারারকে গুলি করতে সক্ষম হয়।

নাটকের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে হিউগোর দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করার সময়ের মধ্যে পার্টির নীতিগত অবস্থান ও কর্মধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রয়াত হোয়েডারার অনুসৃত পথই সঠিক বলে স্থির করা হয়েছে। ফলে হিউগো হয়ে পড়েছে অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তি। কিন্তু হিউগোও ইতিমধ্যে তার কৃতকর্মের মধ্যে সত্যিকার আদর্শবাদিতা বা বীরত্বের উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে, আর তার এই দোদুল্যমানতাই পার্টির দিক থেকে তাকে আবার দলে নেবার একটা সুযোগ করে দেয়। হোয়েডারারকে গুপ্ত হত্যার ব্যাপারটা অস্বীকার করলেই সে পুনর্বাসিত হতে পারবে। ওলগা তাকে দিয়ে বলাতে চেষ্টা করে যে সে হোয়েডারারকে কর্তব্য বা আদর্শের জন্য হত্যা করে নি, বরং নিজের স্ত্রীকে তার আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখতে পেয়ে উত্তেজনার মুহূর্তে তাকে খুন করেছে। কিন্তু হিউগো একথা বলতে পারে না। তার ব্যক্তিগত সততা বীরত্বের আদর্শের সঙ্গে এই রকম সুবিধাবাদী আচরণ অসমঞ্জস। তাই পার্টি প্রেরিত হত্যাকারীদের হাতে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়াকেই সে অধিকতর সম্মানজনক পথ হিসাবে সচেতনভাবে বেছে নেয়।

"নোংরা হাত" সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। রাজনৈতিক বিষয় এর মধ্যে প্রাধান্য পেলেও সঙ্কট মুহূর্তে নীতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিই শেষ পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। হোয়েডারারকে হত্যার বিষয়ে পরবর্তী সময়ে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলে হিউগো যে শুধু নিজের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হত তাই নয়, পার্টির মধ্যেও আবার সে নিজের জায়গা করে নিতে পারতো। কিন্তু হিউগো তা করে না। বরং সে জেনে শুনে মৃত্যু বরণ করে। জনৈক সমালোচকের ভাষায় : "His liquidation coincides with the discovery of individual responsibility."[৪] নাটকটির বর্ণিত পটভূমি মধ্য ইউরোপের

ইলিরিয়া নামক নাৎসী-অধিকৃত একটি দেশ হলেও আমরা স্পষ্ট এর মধ্যে সার্তের স্বদেশ ফ্রান্সকে প্রত্যক্ষ করি। রুবি কোহন লিখেছেন: "Illyria of *Dirty Hands* is as French as Shakespeare's *Twelfth Night* Illyria was English."[৫] নাটকটির মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, নীতিগত প্রশ্নে সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দান, গুপ্ত হত্যার আশ্রয়-গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরার জন্য সার্ত গোঁড়া পার্টি ভক্তবৃন্দ কর্তৃক সমালোচিত ও তিরস্কৃত হন। তারা বলেন যে এহ নাটক রচনা ক'রে তিনি পার্টির ক্ষতি সাধন করেছেন, অবশ্য সার্ত কখনো এই অভিযোগকে মেনে নেন নি। তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্নতর।

"নোংরা হাত"-এর অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে হোয়েডারারের চরিত্র চিত্রণ। তার মানবিক গুণাবলী বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। সে ফাঁপা বৈদগ্ধ্যে বিশ্বাসী নয়, বড়ো বড়ো বুলি আওড়ায় না, কারো আত্মমর্যাদায় আঘাত দেয় না, অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে হিউগোকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত তার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে আমরা এর প্রমাণ পাই : "আর আমি, আমি মানুষ যা তাকে সেজন্যই ভালোবাসি, তাদের সকল নোংরামি, সকল পাপসহ, আমি ভালোবাসি তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের জড়িয়ে ধরা উষ্ণ হাত, তাদের ত্বক, তাদের নগ্নতম ত্বক, তাদের ত্রস্ত দৃষ্টি, এবং যন্ত্রণার বিরুদ্ধে আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যেককে যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় তাকে।" বুর্জোয়া হিউগো কেনো তার স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করছে, অভিজাত প্রিন্স কেনো তার নিজের শ্রেণীর সপক্ষে কাজ করছে, দুটোই হোয়েডারার বহুলাংশে বোঝে। সে অবশ্যই তার পার্টির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা চায়, কিন্তু ওই গুপ্তহত্যাকেও সে নীরব অনুমোদন দেয়, কিন্তু ওই গুপ্তহত্যায় সে যে নিজে অংশ নেয় এমন কোন প্রমাণ নাটকে আমরা পাই না। আর আমরা স্পষ্ট দেখি যে হিউগোকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য সে স্বচ্ছোয় নিজের জীবন বিপন্ন করে।

নিজের পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা এবং সচেতনভাবে দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় ও এর সঙ্গে জড়িত দার্শনিক জিজ্ঞাসাবলী সর্বদাই সার্তের সাহিত্যকর্মে

গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৫১ সালে মঞ্চায়িত ও তার পরের বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সার্তের তিন অঙ্কের নাটক "শয়তান এবং সু-দেবতা"-ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এখানে সার্ত পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন ধর্মীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত ষোড়শ শতকের জার্মানীকে। সময়—কৃষক যুদ্ধ এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের গোড়ার দিক। নাটকের নায়ক গোৎসকে আমরা যখন প্রথম দেখি তখন সে একজন নিষ্ঠুর পাপাচারী, ভাইর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে একটি শহর অবরোধ করেছে। আর সে প্রচণ্ড অহঙ্কারী। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের বিষয়টিই তার কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানেও নিজের আত্মার মুক্তির প্রশ্নের চাইতেও তাকে অধিকতর তীব্রভাবে অধিকার করে রাখে ঈশ্বরের সঙ্গে তার গর্বোদ্ধত সংলাপ, যেন সে আর ঈশ্বর সমান সমান। গোৎস বিশ্বাস করে যে তার পাপকর্মের জন্য সে অভিশপ্ত হবেই, কিন্তু এও তার বিশ্বাস যে ঈশ্বরেরও এ সব ছাড়া উপায় নেই। তবু দলত্যাগী পাদ্রী হাইনরিখ যখন গোৎসকে বলে যে সবাই পাপ করে, শুধু শুভ বা মঙ্গলই অসম্ভব, তখন গোৎস তার বিরোধিতা করে। এবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেয়। সে ছিলো পাপী ও অপরাধী, এবার সে নিজেকে শুধরে নেবে। সে ছিলো শয়তান, এখন হবে সাধু। এখন থেকে সে শুধু ভালো কাজই করবে। কিন্তু গোৎস দেখলো যে নিরঙ্কুশ পাপের মতোই নিরঙ্কুশ শুভকর্মও অসম্ভব। তার সকল সু-উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যাপার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যখন গোৎস দেখে যে সে তার আকাঙ্ক্ষিত আলোর শহর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় শুধু মিথ্যা ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে। গোৎস অন্যায় করতে চায়নি। সে শান্তিবাদী হয়ে উঠে-ছিলো। তার নির্দেশেই তার সৈন্যরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এবার গোৎস আবার একান্ত ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নেয়, প্রাচীন যুগের সাধু-সন্তদের মতো সে আত্মনিপীড়ন করতে শুরু করে, কিন্তু আত্মনিগ্রহ তাকে কোনো মুক্তির সন্ধান দেয় না। প্রাচীন যুগের ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য সন্তদের মতো সে কোনো দৈব সঙ্কেত দেখতে পায় না। এবং তখন সে অকস্মাৎ এই দুনিয়ায় তার উপস্থিতির উদ্ভটতা, এর এ্যাবসার্ডিটি, উপলব্ধি করে। সে আবিষ্কার করে যে "নীরবতা হল ঈশ্বর। না থাকাটা হল ঈশ্বর। ঈশ্বর হল মানুষের একাকীত্ব।" এই একাকীত্বের উপলব্ধি থেকেই সে অন্য মানুষের সঙ্গে

সহযোগিতা, সম্পর্ক ও সহমর্মিতা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। সে কৃষক সেনাবাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হতে চায় কিন্তু সেনাবাহিনীর এই মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন সাধারণ সৈনিক নয়, তাদের দরকার সাহসী ও দক্ষ সেনাধ্যক্ষ। শেষ পর্যন্ত কৃষক যুদ্ধের অন্যতম নেতা ও লুখেরিয় সাধু নাস্‌তির প্রভাবে, তার যুক্তি ও আবেদনে সাড়া দিয়ে, গোৎস তার শান্তিবাদী অবস্থান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে আমরা উচ্চারণ করতে দেখি : "ঈশ্বর আমাকে মানব জাতি থেকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন, তাই আমি ঈশ্বরকে হত্যা করি, কিন্তু এখন দেখছি যে তার মৃত্যু আমাকে আরো সুনিশ্চিত ভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে···আমি এবার মানুষ যেন আমাকে ঘৃণা করে তার ব্যবস্থা করবো, কারণ তাদেরকে ভালোবাসবার অন্য কোনো পথ আমি জানি না। আমি তাদের আদেশ দেবো, কারণ তা ছাড়া মানুষের মধ্যে থাকার আমার আর কোনো রাস্তা নেই।" অনমনীয় দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে গোৎস নিজের জনগণের উপর শৃঙ্খলার শৃঙ্খল চাপিয়ে দেয়, কারণ এছাড়া তাদের মুক্তির অন্য কোনো আশা নেই। গোৎসের নিজের মুক্তিও আসতে পারে শুধু এ পথেই। রুবি কোহনের ভাষায়, "Through Personal need, Goetz heroically accepts the rescue of his people in spite of themselves."[৬] সার্তের বহু চরিত্রের মধ্যে গোৎস অন্যতম শক্তিশালী সৃষ্টি।

১৯৫৩ সালের শেষ দিকে সার্তের "কীন অথবা বিশৃঙ্খলা এবং প্রতিভা" নাটকটি প্যারিসের সারা-বার্নহার্ডট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পাঁচ অঙ্কের এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। প্রধান চরিত্র ইংলন্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অসামান্য জনপ্রিয় ও প্রতিভাশালী মঞ্চাভিনেতা এডমন্ড কীন। কীনের বহু গুণমুগ্ধাদের একজন কাউন্টেস এলেনা। তাঁর সঙ্গে কীনের মিলিত হবার কথা কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলস কীনকে আটকে রাখায় তা সম্ভব হয় না। এদিকে কীনের আরেকজন অনুরাগিনী, এ্যানা ড্যানবি, একই সঙ্গে কীনের স্ত্রী এবং অভিনেত্রী হবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। কীনকে অনুনয় অনুরোধে উত্যক্ত করে এ্যানা শেষ পর্যন্ত মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। এর ফলে এলেনা ঈর্ষাক্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং কীন যখন মঞ্চে অভিনয় করছে

তখন এলেনা দর্শকদের মধ্যে বসে প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে কপট প্রেমাভিনয়ে লিপ্ত হয়। উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ কীন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে, এবং নিজের অসঙ্গত ব্যবহার দ্বারা দর্শককুলকেও অপমান করে। পরবর্তী সময়ে কীনের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ে, এলেনার সঙ্গে তার প্রেমও স্তিমিত হয়ে যায়, কারণ এলেনা আসলে প্রেমে পড়েছিলো অভিনেতা কীনের সঙ্গে, ব্যক্তি কীনের সঙ্গে নয়। এক সময় ঋণের দায়ে কীনের জেলে যাবার অবস্থা হয় কিন্তু উদার ও ক্ষমাশীল প্রিন্স অব ওয়েলস তাকে জেলের হাত থেকে রক্ষা করেন, তবে তাকে নির্বাসনে যেতে হবে। কীন নিউ ইয়র্কে চলে যাবার এবং এ্যানাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ নাটকটি সার্তের মৌলিক কর্ম নয়। ১৮৩৬ সালে খ্রী মাস্কেটীয়ার্স, কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো প্রভৃতি উপন্যাসের বিখ্যাত লেখক স্বদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিক আলেকজান্ডার ডুমা "এডমন্ড কীন অথবা প্রতিভা এবং অমিতাচারী" নামে একটি রোমান্টিক নাটক রচনা করেছিলেন। সার্ত তাকেই রূপান্তরিত ক'রে তাঁর নাটকটি নির্মাণ করেন, তবে ডুমার রোমান্টিকতার জায়গায় সার্ত, প্রত্যাশিত ভাবেই, নিজের নাটকে একটি দার্শনিক মাত্রিকতা এনেছেন, যা তাঁর পূর্বসূরির রচনায় অনুপস্থিত তবে অস্তিত্ববাদী দর্শন এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য ছায়া ফেলেনি। জনৈক সমালোচকের মতে "The problem of identity—the fallacy of founding meaning through other people—is touched upon in *Kean*."[৭]

"কীন"-এর পর ১৯৫৫ সালে প্যারিসের থিয়েটার আঁতোয়াঁ-তে সার্তের "নেক্রাসোভ" নামক আট দৃশ্যের যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তাকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গধর্মী কমেডি বলে অভিহিত করা যায়। এখানে সার্তীয় জীবনদৃষ্টির তেমন কোনো উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেনি এবং নাটকটি "মাছি" কিম্বা "নোংরা হাত" কিম্বা "শয়তান এবং সু-দেবতা"র মতো আলোড়ন সৃষ্টি করতেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু তাঁর পরবর্তী নাটক "দি কনডেমড অব এ্যালটোনা" আবার প্রচুর বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। জার্মানীর পটভূমিতে রচিত পাঁচ অঙ্কের এই

নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৯-এর শেষ দিকে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তার পরের বছর। জার্মানীর পটভূমিতে উপস্থাপিত এই নাটকে অপরাধ, অপরাধের দায়িত্ব এড়াবার জন্য কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, কাল্পনিক ভুবনের অসারতা, বিমূর্ত বীরত্বের আদর্শের পাশে ব্যক্তিগত সাহস ও দুর্বলতা এবং অবশেষে আত্ম-উপলব্ধির পরিণতিতে স্বআরোপিত চরম দণ্ড মাথা পেতে নেওয়া প্রভৃতি বিষয় আবেদনময় নাটকীয়তা নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

নায়ক ফ্রানৎস নাৎসী সামরিক অফিসার থাকা কালীন চরম অত্যাচার নির্যাতন ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর নিজের পাপ ও অপরাধের জন্য অনুতাপ না করে সে পারিবারিক ভবনে একটি কল্পনার জগৎ গড়ে তুলে নিজেকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্বেচ্ছাবন্দী করে রাখে। একমাত্র তার বোন লেনি ছাড়া কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। সমস্ত মানব সমাজ থেকে ফ্রানৎস নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, সময়কে সে মুছে ফেলতে চায়। তেরো বছর ধরে এরকম চলেছে। তারপর তার বৃদ্ধ বিত্তশালী শিল্পপতি পিতার মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়লে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেয়। ভ্রাতৃবধূ জোহানার মুখোমুখি হতে হয় ফ্রানৎসকে এবং সে উপলব্ধি করে যে বীরত্বের যে গৎবাঁধা আদর্শ সে আঁকড়ে ধরেছিলো, পিতার যে-জগৎকে যে-আদর্শকে যে-জীবন ব্যবস্থাকে সে নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলো তা ছিলো ফাঁপা ও কপটতাপূর্ণ, নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি বরং তাকে অনুমোদন করেছিলো। ফ্রানৎস এবং তার পিতা এতোদিন মিথ্যা দেশগৌরব ও মেকী বীরত্বের মৌতাতে নিজেদের আবিষ্ট করে রেখেছিলো। এবার নাৎসীদের সকল পাপ-কর্মের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে দুজনই আত্মহননের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নেয়।

এ নাটকে সার্ত আবারো ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত যুদ্ধ অপরাধের বিষয় তুলে ধরেছেন। জনৈক ভাষ্যকারের ভাষায়, "আবারো সহিংসতা, বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি, ষড়যন্ত্র, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা এমন একটি তীব্র আবেদনময় নাটকের জন্ম দেয় যেখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সামাজিক থীমের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ একাত্ম হয়ে

যায়।···উদ্দেশ্যের গভীরতা এবং চিন্তার জটিলতা তাঁর নাটকে ক্ষুণ্ণ বা দুর্বল হয় নি, সমকালীন মঞ্চে দর্শন ও নাট্যকলার অব্যাহত পারস্পরিক সংযোগের বিষয়টি আবারো এখানে ধরা পড়লো।"[৮]

সার্তের সামগ্রিক নাট্যকর্মের পর্যালোচনা আমাদের এই উপসংহারে পৌঁছে দেয় যে "কীন" এবং "নেক্রসোভ" ছাড়া তাঁর বাকী নাটকগুলি প্রখর বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তা-সমৃদ্ধ। একথা সত্য যে তাঁর নাটকে ধ্রুপদী ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য অনুপস্থিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনার কুশলী পরিবেশনে, বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণ রূপায়ণে এবং সংলাপের ঐশ্বর্যে তাঁর নাটক অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আবেদনময়। তাঁর নাটকের পটভূমি যাই হোক না কেন তিনি সচেতনভাবে তার মধ্যে সমকালীন আধুনিক মানুষের নৈতিক সঙ্কটের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন এবং একাজ করেছেন নাটকের প্রাণরসকে অক্ষুণ্ণ ও অমলিন রেখে। সার্তের নাটককে বাদ দিয়ে শুধু ফরাসী নাট্যকলার নয়, আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। সার্তের নাট্যকর্মের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আমরা সহজেই নিচের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারি : "That they are important as creative products of their time is indisputable."[৯]

তথ্য-নির্দেশ

১ রেমন্ড উইলিয়াম রচিত "ড্রামা ফ্রম ইবসেন টু ব্রেখট", পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৮৩-র পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৫৬

২ ব্রুক এবং শেড সম্পাদিত "মাস্টার্স অব মডার্ন ড্রামা", র‍্যান্ডম হাউস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩, পৃ. ৮০১

৩ প্রাগুক্ত, "মাস্টার্স অব মডার্ন ড্রামা", পৃ. ৮০১

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০১

৫ রুবি কোহন রচিত "কারেন্টস ইন কনটেমপোরারি ড্রামা", ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৩

৬ প্রাগুক্ত, রুবি কোহনের গ্রন্থ, পৃ. ১৩৬

৭ "এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড ড্রামা", চতুর্থ খণ্ড, ম্যাকগ্র হিল বুক কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২, পৃ. ২৮

৮ প্রাগুক্ত, "মাস্টার্স অব মডার্ন ড্রামা", পৃ. ৮০১

৯ প্রাগুক্ত, "এনসাইক্লোপিডিয়া অব মডার্ন ড্রামা", পৃ. ২৭